মানবতা হচ্ছে এমন একটি বিশ্বাসের প্রক্রিয়া যা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন এবং মানুষের সমস্যাবলীর যৌক্তিক পন্থায় সমাধানে কেন্দ্রীভূত। মানুষের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্ক বিচারের শক্তি অর্জনই হচ্ছে মনুষ্যত্ব বা ইনসানিয়ত। সমাজের প্রতিটি সদস্যের স্বার্থের প্রতি সুগভীর অনুরাগই মানবতা। ভদ্রতা, পরোপকার, দয়া, সমালোচনা, ক্ষমা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণাবলী মানবতার জন্য বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। মানুষের মধ্যে দু'টি সত্তা বিদ্যমান-জীবনসত্তা ও মানবসত্তা। জীবসত্তার কাজ প্রাণ ধারণ, আত্মরক্ষা ও বংশ রক্ষা। মানুষ নিজের মধ্যে একটি সত্তার অনুভব করে এটাই মানব জীবনের শ্রেষ্ট দিক। মানুষের রূপ ও কল্পনাকে মানবোচিত করাই মনুষ্যত্ব। বোধ শক্তি সম্পন্ন সৃষ্টি হল মানুষ; এই বোধের বহিঃপ্রকাশই মানবতা।

মানবতার যথার্থ বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কুরআন-হাদীস নির্ভর শিক্ষা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের জন্ম দেয়। আল্লাহ্ পাকের উপর অগাধ বিশ্বাস ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শ বিবর্জিত মানুষ যতই ধন-সম্পদ ও বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী হোক না কেন সে ঘৃণার পাত্র, সমাজের কলঙ্ক ও আল্লাহ্র চোখে অপরাধী। উন্নত চরিত্র মনুষ্যত্বের ভূষণ। হীনতা, লালসা, ও সংকীর্ণতাকে পরিত্যাগ করে চরিত্রকে সুষমা মন্ডিত করতে পারলে মানবতার উৎকর্ষ সাধিত হয়। মহানবী (সা.) পুরো জীবনটাই মানবতার সর্বজনীন কল্যাণে নিবেদিত। তাঁর জীবনাদর্শ বিশ্ব মানবতার উজ্জ্বল স্মারক। আল্লাহ প্রেরিত মহামানব বিশেষত নবী, রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের বিচিত্রতর জীবন অভিজ্ঞতা ও কর্মপ্রয়াসের ইতিহাস অধ্যয়নে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়।

ইসলাম মানবতার ধর্ম, শান্তি, সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম। পশুসত্তাকে অবদমিত করে মানবসত্তাকে জাগ্রত করার জন্য ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। খোদাভীতি, সৎ ও ন্যায় কাজে একে অপরের সহযোগিতার ফলে সমাজে মানবতা ব্যাপ্তি লাভ করে। মহান আল্লাহ্ এই সম্পর্কে বলেন, "সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা" (সূরা আল-মায়েদা :০২)। এই প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখান না" (মিশকাত, হাদীস নং ৪৯৪৭) ।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একে অপরের সাহায্য ও নির্ভরশীলতা ছাড়া জীবন শোষকলায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। মানুষের জীবনের সাথে হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিষাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুর্বল ও অসহায় মানুষের প্রতি ক্ষমতাশালী ও বিত্তবানদের সহানুভূতির হাত সম্প্রসারণ হচ্ছে মানবতা। পরের কল্যাণ ও সুখের জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন যারা দিতে পারেন তারা মানবতাবাদী, মানবহিতৈষী। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার রক্ষার নামই মানবতা। ইসলামী বিধান মতে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। মুসলিম-অমুসলিম, সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন, উঁচু-নিচু সকল ধরণের মানুষ আল্লাহর বান্দা। সমগ্র মানব জাতি একই পরিবারভুক্ত। মহানবী সা. আরো বলেন: "গোটা সৃষ্টি (মাখলুক) আল্লাহ তা'য়ালার পরিবারভূক্ত। সুতরাং সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে (মিশকাত, হাদীস নং ৪৯৯৯) ।

বস্তুত মানব জাতি দেহের ন্যায় এক অখন্ড সত্তা। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যেমন পৃথক করে দেখা যায় না তেমনিভাবে সমাজে বসবাসকারী লোকদেরকেও পরস্পরের তুলনায় খাটো করে দেখা যায় না। কর্মে, ব্যবসায় এবং পদমর্যাদায় একজন অপরজন থেকে পৃথক হতে পারে। কিন্তু মানুষ হিসাবে সকলের মর্যাদাই সমান। মানুষ একে অন্যের ভাই। তাই কেউ কাউকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে অবমাননা করতে পারে না। মানুষ মানুষকে প্রকৃত মর্যাদা দিবে। তা না হলে মানুষ মনুষ্য নামের উপযুক্ত থাকে না। যে মানুষ আত্মমর্যাদার সাথে পরমর্যাদার বিষয়টিকে সংযুক্ত করে আত্ম পর এক করে গ্রহণ করতে পারে, সেই হল প্রকৃত মানুষ। মানুষ যখন ইসলামের উক্ত বিধান তথা মানব ভ্রাতৃত্ববোধের কথা মেনে চলবে তখনই দুনিয়ায় প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিপন্ন মানবতার উৎকর্ষ বিধানের মহান ব্রত নিয়ে এমন এক সময়ে দুনিয়ায় আবির্ভূত হন, যখন আরব উপদ্বীপসহ গোটা পৃথিবীর সম্প্রীতি, নৈতিকতা, মানবিকতাবোধ ও কল্যাণের চরম অবক্ষয় ঘটে। তিনি গোঁড়ামী, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মানবতার মুক্তিবার্তা বহন করেন। মানবিক আদর্শের দীপ্তিতে আলোকিত একটি কল্যাণধর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর নবুওয়তী জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, ধনী-নির্ধন, প্রভু-ভৃত্য, আমীর-ফকীরের জাত্যাভিমানের ভেদাভেদ গুছিয়ে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁর কালজয়ী আদর্শ ও অনুপম শিক্ষায় দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ নিহিত। এ মহামানবের আলোকিত জীবনের প্রতিটি কথা, কাজ, পদক্ষেপ ও অনুমোদন মানব জাতির মুক্তির আদর্শ। অন্যায় ও বঞ্চনা দূর করে সমাজের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর আজীবন সাধনা মানব জাতির অনুপ্রেরণার উৎস। মহান আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে অতি উত্তম আদর্শ” (আল আহযাব :২১)।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। মুসলমানদের মত তারাও নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। ইসলামী সমাজে অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীর জান-মাল, সম্মান, ধর্মাচার, সংস্কৃতি লালন ও চাকুরীর অধিকার নিশ্চিত রয়েছে। মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, “মনে রেখ যে ব্যক্তি কোন মু‘আহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি অত্যাচার, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মানহানী করে অথবা তার কোন সম্পদ জোর পূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে অবস্থান নেব (মিশকাত, পৃ.৩৫৪; কিতাবুল খারাজ, পৃ.৮২)।

মহানবী (সা.) সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কয়েকটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন, যার কঠোর অনুশীলন সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে এ সব নীতিমালাগুলো অনুসরণ করার কারণে সমাজে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তাঁর অনুসৃত নীতিমালা সমূহের মধ্যে রয়েছে; ন্যায় পরায়ণতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য, পারস্পরিক মমত্ববোধ, দান-অনুদান, আত্মত্যাগ, মর্যাদাবোধ, আতিথেয়তা, পরামর্শ প্রভৃতি। সমাজের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক দয়া, সৌহার্দ ও সৌজন্য সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। সহমর্মিতাসুলভ গুণাবলী মানুষকে একে অপরের নিকটে নিয়ে আসে। হিংসা-বিদ্বেষ বিভেদের বীজ বপিত করে। যার ফলশ্রুতিতে সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন যার ভিত্তি ছিল পারস্পরিক সম্মানবোধ, ন্যায় বিচার ও মানবিকতাবোধ (আল হায়সামী, কাশফুল আসতার, ২খ., পৃ. ৩৫)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় ইনসাফপূর্ণ যে সমাজ কায়েম করেন তার ভিত্তি ছিল মানবতাবোধ, নৈতিকতা ও মানবজাতির সার্বজনীনতা। মানুষ যদি রিপুর তাড়নার নিকট পরাভূত হয় তা হলে সুস্থ সমাজের বিকাশধারায় সে কোন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে না। মনুষ্যত্বের উজ্জীবন, চারিত্রিক উৎকর্ষ ও নৈতিক উপলব্ধি সুস্থ সমাজ বিকাশের সহায়ক আর ইন্দ্রিয়জাত প্রবণতা, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, অনিষ্টকর প্রথা সমাজের সুস্থতার ভিত্তিমূলকে একেবারে নড়বড়ে করে দেয়, জন্ম হয় যুলুম ও না-ইনসাফীর। এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জুয়া খেলা, মদ্যপান, নেশাগ্রহণ, কুসীদপ্রথা, যিনা-সমকামিতা ও অহেতুক রক্তপাত নিষিদ্ধ করে দেন (জালালউদ্দীন সায়ূতী, দুর আল মানসুর, ১খ., পৃ. ৩৯১; ইব্ন কাসীর, সিরাতুন নবুবিয়াহ, ৪খ, ১৯৭৮, পৃ.৩৯২)। ফলে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের ভয়াবহতার হাত হতে মানুষ রেহাই পায়। সভ্যতার অভিশাপ হতে মানুষকে মুক্তি দিয়ে ধর্ম নিয়ন্ত্রিত ও মানবিকতায় উজ্জীবিত নতুন সমাজের গোড়াপত্তন হল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিশ্ব মানবতার প্রতি এটা মহান রাসূলের ইহসান। মানবতা হচ্ছে এমন একটি বিশ্বাসের প্রক্রিয়া যা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন এবং মানুষের সমস্যাবলীর যৌক্তিক পন্থায় সমাধানে কেন্দ্রীভূত। মানুষের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্ক বিচারের শক্তি অর্জনই হচ্ছে মনুষ্যত্ব বা ইনসানিয়ত। সমাজের প্রতিটি সদস্যের স্বার্থের প্রতি সুগভীর অনুরাগই মানবতা। ভদ্রতা, পরোপকার, দয়া, সমালোচনা, ক্ষমা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণাবলী মানবতার জন্য বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ

ভুমিকা পালন করে। মানুষের মধ্যে দু'টি সত্তা বিদ্যমান-জীবনসত্তা ও মানবসত্তা। জীবসত্তার কাজ প্রাণ ধারণ, আত্মরক্ষা ও বংশ রক্ষা। মানুষ নিজের মধ্যে একটি সত্তার অনুভব করে এটাই মানব জীবনের শ্রেষ্ট দিক। মানুষের রূপ ও কল্পনাকে মানবোচিত করাই মনুষ্যত্ব। বোধ শক্তি সম্পন্ন সৃষ্টি হল মানুষ; এই বোধের বহিঃপ্রকাশই মানবতা।

মানবতার যথার্থ বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কুরআন-হাদীস নির্ভর শিক্ষা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের জন্ম দেয়। আল্লাহ্ পাকের উপর অগাধ বিশ্বাস ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শ বিবর্জিত মানুষ যতই ধন-সম্পদ ও বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী হোক না কেন সে ঘৃণার পাত্র, সমাজের কলঙ্ক ও আল্লাহ্র চোখে অপরাধী। উন্নত চরিত্র মনুষ্যত্বের ভূষণ। হীনতা, লালসা, ও সংকীর্ণতাকে পরিত্যাগ করে চরিত্রকে সুষমা মন্ডিত করতে পারলে মানবতার উৎকর্ষ সাধিত হয়। মহানবী (সা.) পুরো জীবনটাই মানবতার সর্বজনীন কল্যাণে নিবেদিত। তাঁর জীবনাদর্শ বিশ্ব মানবতার উজ্জ্বল স্মারক। আল্লাহ প্রেরিত মহামানব বিশেষত নবী, রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের বিচিত্রতর জীবন অভিজ্ঞতা ও কর্মপ্রয়াসের ইতিহাস অধ্যয়নে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়।

ইসলাম মানবতার ধর্ম, শান্তি, সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম। পশুসত্তাকে অবদমিত করে মানবসত্তাকে জাগ্রত করার জন্য ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। খোদাভীতি, সৎ ও ন্যায় কাজে একে অপরের সহযোগিতার ফলে সমাজে মানবতা ব্যাপ্তি লাভ করে। মহান আল্লাহ্ এই সম্পর্কে বলেন, "সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা" (সূরা আল-মায়েদা :০২)। এই প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখান না" (মিশকাত, হাদীস নং ৪৯৪৭) ।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একে অপরের সাহায্য ও নির্ভরশীলতা ছাড়া জীবন শোষকলায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। মানুষের জীবনের সাথে হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিষাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুর্বল ও অসহায় মানুষের প্রতি ক্ষমতাশালী ও বিত্তবানদের সহানুভূতির হাত সম্প্রসারণ হচ্ছে মানবতা। পরের কল্যাণ ও সুখের জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন যারা দিতে পারেন তারা মানবতাবাদী, মানবহিতৈষী। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার রক্ষার নামই মানবতা। ইসলামী বিধান মতে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। মুসলিম-অমুসলিম, সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন, উঁচু-নিচু সকল ধরণের মানুষ আল্লাহর বান্দা। সমগ্র মানব জাতি একই পরিবারভুক্ত। মহানবী সা. আরো বলেন: "গোটা সৃষ্টি (মাখলুক) আল্লাহ তা'য়ালার পরিবারভূক্ত। সুতরাং সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে (মিশকাত, হাদীস নং ৪৯৯৯) ।

বস্তুত মানব জাতি দেহের ন্যায় এক অখন্ড সত্তা। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যেমন পৃথক করে দেখা যায় না তেমনিভাবে সমাজে বসবাসকারী লোকদেরকেও পরস্পরের তুলনায় খাটো করে দেখা যায় না। কর্মে, ব্যবসায় এবং পদমর্যাদায় একজন অপরজন থেকে পৃথক হতে পারে। কিন্তু মানুষ হিসাবে সকলের মর্যাদাই সমান। মানুষ একে অন্যের ভাই। তাই কেউ কাউকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে অবমাননা করতে পারে না। মানুষ মানুষকে প্রকৃত মর্যাদা দিবে। তা না হলে মানুষ মনুষ্য নামের উপযুক্ত থাকে না। যে মানুষ আত্মমর্যাদার সাথে পরমর্যাদার বিষয়টিকে সংযুক্ত করে আত্ম পর এক করে গ্রহণ করতে পারে, সেই হল প্রকৃত মানুষ। মানুষ যখন ইসলামের উক্ত বিধান তথা মানব ভ্রাতৃত্ববোধের কথা মেনে চলবে তখনই দুনিয়ায় প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিপন্ন মানবতার উৎকর্ষ বিধানের মহান ব্রত নিয়ে এমন এক সময়ে দুনিয়ায় আবির্ভূত হন, যখন আরব উপদ্বীপসহ গোটা পৃথিবীর সম্প্রীতি, নৈতিকতা, মানবিকতাবোধ ও কল্যাণের চরম অবক্ষয় ঘটে। তিনি গোঁড়ামী, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মানবতার মুক্তিবার্তা বহন করেন। মানবিক আদর্শের দীপ্তিতে আলোকিত একটি কল্যাণধর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর নবুওয়তী জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।

শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, ধনী-নির্ধন, প্রভু-ভৃত্য, আমীর-ফকীরের জাত্যাভিমানের ভেদাভেদ গুছিয়ে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁর কালজয়ী আদর্শ ও অনুপম শিক্ষায় দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ নিহিত। এ মহামানবের আলোকিত জীবনের প্রতিটি কথা, কাজ, পদক্ষেপ ও অনুমোদন মানব জাতির মুক্তির আদর্শ। অন্যায় ও বঞ্চনা দূর করে সমাজের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর আজীবন সাধনা মানব জাতির অনুপ্রেরণার উৎস। মহান আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে অতি উত্তম আদর্শ” (আল আহযাব :২১)।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। মুসলমানদের মত তারাও নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। ইসলামী সমাজে অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীর জান-মাল, সম্মান, ধর্মাচার, সংস্কৃতি লালন ও চাকুরীর অধিকার নিশ্চিত রয়েছে। মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, “মনে রেখ যে ব্যক্তি কোন মু‘আহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি অত্যাচার, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মানহানী করে অথবা তার কোন সম্পদ জোর পূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে অবস্থান নেব (মিশকাত, পৃ.৩৫৪; কিতাবুল খারাজ, পৃ.৮২)।

মহানবী (সা.) সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কয়েকটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন, যার কঠোর অনুশীলন সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে এ সব নীতিমালাগুলো অনুসরণ করার কারণে সমাজে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তাঁর অনুসৃত নীতিমালা সমূহের মধ্যে রয়েছে; ন্যায় পরায়ণতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য, পারস্পরিক মমত্ববোধ, দান-অনুদান, আত্মত্যাগ, মর্যাদাবোধ, আতিথেয়তা, পরামর্শ প্রভৃতি। সমাজের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক দয়া, সৌহার্দ ও সৌজন্য সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। সহমর্মিতাসুলভ গুণাবলী মানুষকে একে অপরের নিকটে নিয়ে আসে। হিংসা-বিদ্বেষ বিভেদের বীজ বপিত করে। যার ফলশ্রুতিতে সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন যার ভিত্তি ছিল পারস্পরিক সম্মানবোধ, ন্যায় বিচার ও মানবিকতাবোধ (আল হায়সামী, কাশফুল আসতার, ২খ., পৃ. ৩৫)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় ইনসাফপূর্ণ যে সমাজ কায়েম করেন তার ভিত্তি ছিল মানবতাবোধ, নৈতিকতা ও মানবজাতির সার্বজনীনতা। মানুষ যদি রিপুর তাড়নার নিকট পরাভূত হয় তা হলে সুস্থ সমাজের বিকাশধারায় সে কোন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে না। মনুষ্যত্বের উজ্জীবন, চারিত্রিক উৎকর্ষ ও নৈতিক উপলব্ধি সুস্থ সমাজ বিকাশের সহায়ক আর ইন্দ্রিয়জাত প্রবণতা, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, অনিষ্টকর প্রথা সমাজের সুস্থতার ভিত্তিমূলকে একেবারে নড়বড়ে করে দেয়, জন্ম হয় যুলুম ও না-ইনসাফীর। এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জুয়া খেলা, মদ্যপান, নেশাগ্রহণ, কুসীদপ্রথা, যিনা-সমকামিতা ও অহেতুক রক্তপাত নিষিদ্ধ করে দেন (জালালউদ্দীন সায়ূতী, দুর আল মানসুর, ১খ., পৃ. ৩৯১; ইব্ন কাসীর, সিরাতুন নবুবিয়াহ, ৪খ, ১৯৭৮, পৃ.৩৯২)। ফলে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের ভয়াবহতার হাত হতে মানুষ রেহাই পায়। সভ্যতার অভিশাপ হতে মানুষকে মুক্তি দিয়ে ধর্ম নিয়ন্ত্রিত ও মানবিকতায় উজ্জীবিত নতুন সমাজের গোড়াপত্তন হল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিশ্ব মানবতার প্রতি এটা মহান রাসূলের ইহসান।